SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

# সামাজিক জীবনে গীতার সাংখ্য-যোগের অবদান

**Dilip Tapadar**
Research Scholar,
Department of Sanskrit Pali & Prakrit
Visva-Bharati, Santiniketan, West Bengal, India
Email: diliptapadar343@gmail.com

**Abstract:** সম্পূর্ণ ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক অনন্য ও উচ্চস্থানীয় ধর্মগ্রন্থ, যা সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সারমর্মরূপে বিবেচিত, কারণ এর শিক্ষাগুলি ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধির চূড়ান্ত সমন্বয় উপস্থাপন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত এই গীত, কেবলমাত্র মহাভারতের যুদ্ধক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যপথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রদত্ত উপদেশই নয়, বরং মানবজীবনের সর্বস্তরে প্রযোজ্য এক চিরন্তন জীবনদর্শন। এই গ্রন্থে যে আদর্শ, দর্শন ও উপদেশগুলি তুলে ধরা হয়েছে, তা প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সমাজ জীবনে নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ এবং আত্মিক উন্নতির পথ দেখায়। বিশেষত, গীতার *সাংখ্য-যোগ* অধ্যায়ে আত্মা ও দেহের পার্থক্য, কর্মের মধ্যে আসক্তিহীনতা এবং চিরন্তন সত্যের উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনে সঠিক পথ বেছে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টি মূলত মানুষের ভিতরের দ্বন্দ্বকে নিরসন করে তাকে জ্ঞান ও বিচারের মাধ্যমে স্থিতধী অর্থাৎ ধৈর্যবান ও আত্মনির্ভর মানুষে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেয়। অতএব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিছক ধর্মীয় উপদেশগ্রন্থ নয়—এটি এক সমন্বিত জীবনদর্শন, যা প্রতিটি মানুষকে তার আত্মপরিচয়, কর্তব্য, এবং আত্মমুক্তির পথ চিনিয়ে দেয়।

**Keywords:** গীতা, সাংখ্য-যোগ, আত্মতত্ত্ব, স্বধর্ম, স্বকর্ম।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার বিষয় ভারতীয় সাহিত্যে উচ্চস্থানে বর্তমান। গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত, তাই গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির অনলে শুদ্ধ করে উপাসনায় পরিণত করার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয়, তা মানবের কর্ম জীবনের অনন্য অবলম্বন। অর্জুনের মানসিক দ্বন্দ্ব ও শোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে দর্শনের শিক্ষা দিয়েছেন, তা শুধু একটি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নয়— সমগ্র সংসারজীবনের জন্য প্রযোজ্য। গীতার মূল লক্ষ্য আত্মার সত্য পরিচয়, শরীর ও আত্মার পার্থক্য, এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করানো। অতএব, গীতা কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; এটি মানব জীবনের সার্বিক বিকাশের এক অসাধারণ দিশারি— যেখানে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি একে অপরের পরিপূরক হয়ে মানুষের জীবনে আনে পরম শান্তি ও মুক্তির আলো। গীতার শিক্ষা কেবল ধর্মীয় নয়, বরং নৈতিক, দার্শনিক ও প্রজ্ঞাভিত্তিক। এটি জীবনকে শুধু ত্যাগমুখী নয়, কর্মমুখী করে তোলে। গীতায় বলা হয়েছে, জীবনের প্রতিটি কাজ যেন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করে করা হয়, যাতে কর্মে আসক্তি না জন্মায় এবং মানসিক শান্তি বজায় থাকে।

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"॥[1]

গীতা একদিকে যেমন আত্মার অমরত্ব, পুনর্জন্ম, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে, অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা ও দায়িত্ব-কর্তব্যেরও দিকনির্দেশ দেয়। এটি এমন এক গ্রন্থ যা সংসারে থেকেও সংসারকে অতিক্রম করার সাধনা শেখায়। যেখানে মানুষ ভোগ ও লোভে আক্রান্ত, সেখানে গীতা উপদেশ দেয়— সংযমের, সৎকর্মের, ও আত্মশুদ্ধির। যেখানে সমাজ বিভাজনের দিকে ধাবিত, গীতা শেখায় সবার মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধি। সুতরাং, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল এক ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি মানবজীবনের বহুমাত্রিক দিককে স্পর্শ করা এক সর্বজনগ্রাহ্য জীবনদর্শন।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় *সাংখ্যযোগ*। গীতার এই দ্বিতীয় অধ্যায় গীতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে— যেখানে আত্মার প্রকৃতি, জীবনের লক্ষ্য ও কর্মের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অধ্যায়ে শরণাগত অর্জুন দ্বারা নিজের শোকের নিবৃত্তির জন্য একান্তিক উপায় জানতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। অর্জুনের বিভ্রান্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানপ্রবাহে দূর হয়, তেমনই এই জ্ঞান আধুনিক মানুষকেও শোক, ভয় ও দ্বিধা থেকে মুক্তি দিতে পারে। সাংখ্যযোগে আত্মতত্ত্বের সাধনে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনই মুখ্য। সাংখ্যযোগ শুধু জ্ঞানের অনুশীলন নয়, তা কর্ম ও কর্তব্যের সঠিক উপলব্ধির পথও সুস্পষ্ট করে দেয়। এই অধ্যায়ে আত্মতত্ত্বের সাথে স্বধর্মের বর্ণন্ তথা কর্মযোগের স্বরূপও বোঝানো হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবনের তিন মহা সিদ্ধান্তের কথা বলা হয়েছে— আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতা, দেহের ক্ষুদ্রতা ও স্বধর্মের অবাধ্যতা। এর মধ্যে স্বধর্ম সিদ্ধান্ত কর্তব্যরূপে ও বাকি দুই জ্ঞাতব্যরূপে জানা হয়। স্বধর্মাচরনের পূর্বে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক, কারণ তত্ত্বজ্ঞান মনে অঙ্কিত হলে স্বধর্মাচরণ সহজ হয়।

**আত্মতত্ত্ববিবেচন—**

আধুনিক জীবনে যেখানে ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং কর্মফলে আসক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানে গীতার আত্মতত্ত্ব এক মুক্তির পথ দেখায়। গীতা নিজের কর্ম থেকে চ্যুত মানুষকে জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপদেশ দেয়। গীতার মতে শরীর নশ্বর তথা এখানে বিদ্যমান আত্মা অজর, অমর, তথা অবিনাশী। অতএব দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে আত্মজ্ঞানের প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করা উচিৎ এর থেকেই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞানের অভাবেই মানুষ দেহকেন্দ্রিক চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে পড়ে এবং আত্মাকে ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে ওঠে, ফলে তার জীবনে নেমে আসে সংশয়, দুঃখ, ভয় ও অবসাদ। আত্মজ্ঞানের অভাব ও দেহাসক্তির কারণে মানুষ কারো মৃত্যু হলে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু এই দেহাসক্তি প্রেম নয়, পরন্তু দেহাসক্তিকে দূর না করলে সত্য প্রেমের উদয় হয় না। আত্মা যখন চেতনার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত হয়, তখন মানুষ এক ধীর, স্থির ও শান্ত অবস্থায় পৌঁছায়—যাকে গীতায় বলা হয়েছে "স্থিতপ্রজ্ঞ" অবস্থা। যখন দেহাসক্তি চলে যায় তখন বোধ হয় যে দেহ কেবল সেবার এক সাধন, কিন্তু বর্তমানে আমরা দেহের পূজাকেই নিজেদের সাধ্য বলে মনে করি। আমরা ভুলে যায় সাধ্য হল স্বধর্মাচরণ। দেহের সেবা স্বধর্মাচরণের জন্যই করা উচিৎ, জিহ্বার লালসা পূর্তির জন্য নয়। কিন্তু আমরা দেহকে সাধনরূপে কর্মে নিযুক্ত না করে তাতেই ডুবে গিয়ে আত্মসংকোচ করতে থাকি। তাই গীতায় বলা হয়েছে—

"দেহিনোঽস্মিন্যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি"॥[2]

যেমন দেহীর এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর কোন

পরিবর্তন হয় না, সেরূপ দেহান্তর প্রাপ্তিতে দেহী অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকারমাত্র। এইজন্য দেহান্তরপ্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানীগণ মোহগ্রস্ত হন না। এছাড়াও আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতার বিষয়ে গীতায় আরও বলা হয়েছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা২ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতো২য়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"॥[3]

আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। আত্মার উৎপত্তি হয়নি, হচ্ছে না, হবেও না। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চির নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। শরীরে যেমন কুমারাবস্থা, যুবাবস্থা এবং জরাবস্থা আসে ,ঠিক তেমন আত্মা এক শরীর থেকে অন্য শরীর গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মাদিকে দেখে দুঃখী হও না, যুদ্ধে যদি তাদের মৃত্যুও হয় তাহলে কেবল তাদের শরীর বিনষ্ট হবে, তাতে স্থিত আত্মার বিনষ্ট হয় না, কারন আত্মা জন্ম মৃত্যু রহিত। এইভাবে, গীতার দর্শনে আত্মাকে চিরন্তন, পরিবর্তনশীল শরীরের মধ্যে অবিনশ্বর সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব, আত্মার এই অমরত্ব ও চিরন্তনত্বে যদি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তাহলে অর্জুনের মতো আমাদেরও মৃত্যু-ভয় দূর হবে এবং শোকের আবেগ প্রশমিত হবে। এইভাবেই গীতা কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং জীবনের গভীরতম রহস্য ও অস্তিত্বের তাৎপর্য বোঝার এক অতুলনীয় পথপ্রদর্শক। আত্মার অমরত্বের এই বোধ আমাদের জীবন ও মৃত্যু, আনন্দ ও শোক—সবকিছুকে দেখার এক নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

**স্বধর্মাচরণ—**

'স্বধর্ম' শব্দটি দুইটি উপাদানে গঠিত—'স্ব' অর্থে নিজের এবং 'ধর্ম' অর্থে কর্তব্য, নিয়ম বা ধর্মচরন। গীতা যে স্বধর্মের কথা বলে, তা একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও অন্তর্জাত। এটি কারও ওপর আরোপিত নয়, বরং ব্যক্তির গুণ, স্বভাব ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গীতায় সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মুখ্য দুই ভাব— বুদ্ধিধর্ম ও মনসহিত ইন্দ্রিয় ধর্মকে গ্রহণ করা হয়েছে। মনের বাসনাকে বুদ্ধি অনুযায়ী রাখা এবং বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞ রাখাই স্বধর্ম। অর্জুন রণভূমিতে স্থিত দুইপক্ষের সেনায় নিজের স্বজন, গুরুজন তথা বান্ধবদের দেখে এবং যুদ্ধ সংগ্রামের পরিণামে তাদের মৃত্যুর কথা চিন্তা করে কুল ক্ষয়াদি পাপের কথা ভেবে যুদ্ধ থেকে বিরত হলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তোমার শোক করা অনুচিৎ কারণ বুদ্ধিমান কারো প্রাণ চলে গেলে বা না গেলে শোক করে না; অর্জুন যে শোক করছে তা মোহ এবং অহিংসা ধর্মের দুরূপয়োগ। যেভাবে ধর্ম অধর্মে পরিণত হয়, যেমন— যজ্ঞ, দান, তপ ইত্যাদিকে ধর্মের মুখ্যরূপে জানা যায়, কিন্তু এগুলির যথাযথ বিনিয়োগ না হলে তা অধর্মে পরিণত হয়। আর হিংসাদি বিধি বর্জিত পাপ কর্মও ধর্ম যুদ্ধাদি কর্তব্যে বিনিয়োগ হয়ে ধর্মে পরিণত হয়। এই ভাব তত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিমিত্ত করে মনুষ্য সমাজের কল্যানের জন্য প্রকট করেন। তাই স্বধর্মের পালনে সুখ এবং অপালনে দুঃখ দেখা দেয়। স্বধর্ম মানে শুধু জাতিগত বা পারিবারিক দায়িত্ব নয়—এটি একজন মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, গুণ, ও অবস্থান অনুসারে তার কর্তব্যের নির্ধারণ। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধর্ম অনুকরণে নয়, বরং নিজস্ব ধর্মচরনেই পরম কল্যাণ নিহিত। সেই স্বধর্ম পালনে যদি মৃত্যুও আসে, তা পরম প্রশান্তিময়, কারণ তা কর্তব্যের পথ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে যুদ্ধ হলে জয় বা পরাজয় হয়; জয় লাভ আনে এবং পরাজয় ক্ষতি আনে। লাভ সুখের দিকে নিয়ে যায় আর ক্ষতি দুঃখের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু যদি তুমি

ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করো, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়ে সমতা বজায় রাখো, তাহলে তুমি কোন পাপের অংশীদার হবে না।

"সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি"॥[4]

অতএব, আত্মা অমর, শরীর নশ্বর—এই জ্ঞান নিয়ে, অহংকার বা মোহ ছাড়াই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যদি নিজের ধর্ম ও কর্তব্য পালন করি, তবেই আমাদের জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সাধিত হবে। অতএব দেশ, কাল, বস্তু অনসারে নিয়ত যা আমাদের কর্তব্য কর্ম তা পালন করা উচিৎ, তাতে সেটি যত কষ্টসাধ্যই হোক।

**কর্ম বিবেচন—**

দেহকে তুচ্ছ মেনে আত্মার অমরতা ও অখণ্ডতার উপর দৃষ্টি রেখে স্বধর্মের আচরণ কৌশলের কথাও গীতায় বলা হয়েছে। ভগবান বলেছেন স্বধর্মবিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নেই। কখনো নিজেকে কর্মফলের হেতু বলে মনে করো না এবং কখনও স্বধর্মাচরণ না করার প্রতিও আসক্ত হয়ো না—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গো২স্ত্বকর্মণি"॥[5]

মানুষ যখন তার কর্মফলের প্রত্যাশা করে, তখন সে কার্য-কারণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই সে কর্মের ফলস্বরূপ সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। যেমন যজুর্বেদে বলা হয়েছে—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতো২স্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে"॥[6]

অর্থাৎ এজগতে শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল করেই শতবর্ষ বাঁচতে ইচ্ছা করবে। এই প্রকার মনুষ্যত্বাভিমানি তোমার পক্ষে এইভাবে কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই যাতে অশুভ কর্ম তোমাতে লিপ্ত হবে না। ফলের আশা ত্যাগ করার সাথে গীতা একথাও বলে যে, কর্ম উত্তমতা ও দক্ষতার সাথে করা উচিৎ। সকাম পুরুষের তুলনায় নিষ্কাম পুরুষের কর্ম অধিক উত্তম হওয়া উচিৎ। কারণ সকাম পুরুষ ফলাসক্ত হয়, যার কারণে তার ফলসম্বন্ধী চিন্তায় কিছু সময় ও শক্তি ব্যতীত হয়। কিন্তু ফলেচ্ছারহিত পুরুষ প্রতি ক্ষণ এবং সমস্ত শক্তি কেবল কর্মে নিযুক্ত করে। নিষ্কাম কর্মের এক সাত্ত্বিক আনন্দ আছে, এই আনন্দই এই কর্মের মুখ্য ফল। যে ব্যক্তি সমস্ত কামনাকে ত্যাগ করে স্পৃহারহিত, মমতারহিত তথা অহংকাররহিত হয়ে বিচরণ করে, সেই ব্যক্তি শান্তি পায়, যথা—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ ধনম্"॥[7]

গীতা মানুষের মনোযোগ কর্মের উপর কেন্দ্রীভূত করে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কর্মফলের উপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। ফলে কর্মের উপর পূর্ণ একাগ্রতার অভাবে কর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যার ফলে কর্মফলও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই কারণেই ফলের প্রতি আচ্ছন্ন ব্যক্তি দুঃখ, অস্থিরতা এবং মানসিক চাপে ডুবে তার জীবনকে নরকে পরিণত করে। অন্যদিকে, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা ব্যক্তির জীবনে কিছু বিশেষ বৈশিষ্টের উদ্ভব হয়। যখন একজন ব্যক্তি নিঃস্বার্থ অবস্থায় থাকে, তখন তার ফলের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না, তাই সে কোন খারাপ কাজের প্রতি প্রবৃত্ত হয় না। সকাম ব্যক্তি ভালো ফল পাওয়ার জন্য ভালো কর্ম করে কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তির এইরকম সৎ কর্মের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না। তিনি পূর্ণ দক্ষতা এবং

পূর্ণ শক্তির সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন। কর্মফল ত্যাগের অর্থ কর্ম ত্যাগ করা নয় বরং আরও দক্ষতা ও চতুরতার সাথে কর্ম করা। গীতায় একে "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" বলা হয়েছে। তিনি সাফল্য এবং ব্যর্থতা উভয় ক্ষেত্রেই সমতা বজায় রাখেন। এই কারণেই একে "সমত্ব যোগ" ও বলা হয়েছে— "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভুত্ত্বা সমত্ত্বং যোগ উচ্যতে"।[৪]

গীতা মানুষকে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার উপায় দেখায়। ফলের আশা ত্যাগ করে তথা উৎসর্গের ভাবনা গ্রহণ করে মনুষ্য নিজেকে শুদ্ধ করতে পারে। মানুষের রক্তে মানুষের হৃদয়কে নির্মল করার ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু মনের বাসনাকে পরিত্যাগ করে যে কোন ব্যক্তি নিজের হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে। আজকের প্রতিযোগিতামূলক পৃথিবীতে মানুষ নিরন্তর ফলের পেছনে ছুটছে— চাকরি, অর্থ, খ্যাতি, সামাজিক স্বীকৃতি ইত্যাদি। কিন্তু এই অস্থির ছুটে চলায় অধিকাংশ মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। গীতার কর্মনীতি এখানে এক পরিত্রাণের পথ দেখায়। যদি আমরা প্রতিটি কাজকে কর্তব্যজ্ঞান থেকে, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে করি — এবং ফলের চিন্তা ত্যাগ করে তা "অর্পণ" করি— তাহলে আমরা চাপমুক্ত, স্থিতধী ও আনন্দিত থাকতে পারি।

গীতায় শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন জীবনের অন্তকালে যে কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করতে করতে নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে শীঘ্রই ঈশ্বরের স্বভাবকে প্রাপ্ত করে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন ব্রহ্মজ্ঞানের দশায় মোহ অথবা অজ্ঞান সমাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মানন্দ প্রদানকারক মুক্তিলাভ পাওয়া যায়। দৈহিক প্রলোভনের ওপর যে যত বিজয় লাভ করে সে তত নিজের লক্ষ্যের দিকে পৌঁছাই। লক্ষ্যের তাৎপর্য নিষ্কাম কর্মে, নিষ্কাম কর্মের লক্ষ্য হল আত্মলাভ ও ঈশরপ্রাপ্তি। আত্মলাভের তাৎপর্য হল ব্রাহ্মী স্থিতির উপলব্ধি। কর্মযোগের এটি সর্বোৎকৃষ্ট উপলব্ধি। এর থেকে মোক্ষের প্রাপ্তি হয়—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি"॥[৯]

অর্থাৎ, পরম আত্মার এই ব্রাহ্মী স্থিতি অর্জনকারী ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্তেও বিভ্রান্ত হয় না, তার মনের স্থিতি অটল থাকে এবং সে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে নির্বাণ লাভ করে। গীতার এই দার্শনিক শিক্ষা আজকের আধুনিক বিশ্বে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে মানুষ বহুল প্রতিযোগিতায় জর্জরিত, মানসিক চাপের অধীনে ভুগছে, সেখানে গীতার কর্মযোগ আমাদের শেখায়—জীবনকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে, নিজের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হতে এবং ফলের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হতে। এভাবেই আমরা নিজেদের মনের অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, সত্যিকারের শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি এবং আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন করতে পারি।

**উপসংহার—**

গীতা মানবজীবনের উন্নতি, মুক্তি ও কল্যাণের চিরন্তন দিশারী। গীতার সাংখ্য-যোগ নামক অধ্যায় থেকে অর্জিত আত্মজ্ঞান মানুষকে জন্ম-মরণ ও মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত করে, সত্যিকারের নির্ভয়তা ও স্থিতপ্রজ্ঞতা প্রদান করে। যেমন অর্জুন নিজের স্বজনদের মৃত্যুভয়ে বিপর্যস্ত ছিলেন, তেমনি আজকের সমাজেও বহু মানুষ দুঃখ ও অজ্ঞানতার কারণে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু গীতার জ্ঞান মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে, তাকে মৃত্যুর ভয়াতুরতা ও সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে অনন্তশান্তির সন্ধান দেয়। গীতা সত্য নির্ভয়তা দান করে। যে গীতার এই জ্ঞানামৃত পান করে, সে এই বাহ্য মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত

হয়। গীতার সাংখ্য-যোগের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, সাধক যেন অধর্ম ও পরধর্মের রাস্তা ত্যাগ করে স্বধর্মের সহজ-সরল রাস্তায় চলে। দেহ ক্ষণভঙ্গুর এই ভেবে তার উপযোগ কেবল স্বধর্মের জন্য করা উচিৎ, প্রয়োজন হলে স্বধর্মের জন্য তার ত্যাগ করতেও সংকোচ বোধ যেন না হয়। যারা সাধারণ কর্ম করে থাকে তাদের কর্ম বিষয়ে দুই ধরনের ভাবনা, যথা— যে কর্ম করা হবে তার ফল অবশ্যই ভোগ করা হবে আর যদি কর্মের ফল না পাওয়া যায় তাহলে সেই কর্ম থেকে বিরত হওয়া। কিন্তু গীতা এর অতিরিক্ত এক ভাবনা প্রদান করে যে, কর্ম অবশ্যই করো কিন্তু ফলে নিজের অধিকার রেখো না। যে কর্ম করে তার ফলে অবশ্যই অধিকার আছে, কিন্তু এই অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা উচিৎ।'কর্ম করো, ফলের অধিকার ত্যাগ করো'—এই মহান দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে কর্মে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। ফলনিরপেক্ষ কর্মপথে আত্মিক শান্তি ও সমাধির সমতা অর্জিত হয়, যা মানুষকে পরম আনন্দে ভাসিয়ে তোলে। গীতার মাধ্যমে মানুষ যখন কর্ম ফল থেকে নিজেদের দৃষ্টি সরিয়ে নেয় তখন কর্মে তাদের তন্ময়তা অধিকগুণ বর্ধিত হয়। ফলনিরপেক্ষ পুরুষের কর্মবিষয়ক তন্ময়তা সমাধির সমতা লাভ করে। এই জন্য তার আনন্দ অন্যের থেকে অধিকগুণ বেশি হয়। গীতা এমন এক জ্ঞান ও দর্শন যা মানবজীবনের অন্ধকার কেটে দিয়ে মুক্তি, স্থিতপ্রজ্ঞতা ও পরম তৃপ্তির আলো ছড়িয়ে দেয়। এই মহান শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত বাণী আমাদের কর্ম ও জীবনযাত্রাকে অর্থপূর্ণ করে, অন্তরের অশান্তি ও দ্বিধা দূর করে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ সুগম করে।

## Endnotes

1. গীতা, ১৮/৬৬
2. গীতা, ২/১৩
3. গীতা, ২/২০
4. গীতা, ২/৩৮
5. গীতা, ২/৪৭
6. ঈশোপনিষৎ, ১/২
7. ঈশোপনিষৎ, ১/১
8. গীতা, ২/৪৮
9. গীতা, ২/৭২

## Bibliography


- অভয়চরণারবিন্দ, সম্পাদক। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ*। মুম্বইঃ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০২০।
- অড়গড়ানন্দজী, সম্পাদক। *যথার্থ গীতা* । মুম্বাইঃ শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস্ট, ২০২০।
- জগদানন্দ, সম্পাদক। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯।
- জুষ্টানন্দ, অনুবাদক। *ঈশোপনিষৎ*। কলিকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৫।
- ---, অনুবাদক। *কঠোপনিষৎ* (শাঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ ও তাৎপর্য সমন্বিত)। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬।
- ---, অনুবাদক। *কেনোপনিষৎ* (শাঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ ও তাৎপর্য সমন্বিত)। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬।
- বাসুদেব, হরিদত্ত, সম্পাদক। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* (ভাষা টীকা সহিত)। বম্বঈঃ কারমাইকল হাউস, ২০০৭ [২০০০]।

- বিবেকানন্দ, সম্পাদক। *ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবদ্‌গীতা*। নাগপুরঃ রামকৃষ্ণ মঠ পাব্লিকেশন, ২০১৭।
- হরিভাঊ, সম্পাদক। *গীতা-প্রবচন*। রাজঘাট, কাশীঃ অখিল ভারত সর্ব-সেবা-সংঘ-প্রকাশন, ১৯৬০।

Online source

- https://bhagavadgita.io>chapter
- https/:www.swami-krishnanda.org>


——